কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প

অবচেতন মনের কথা

ডা. সানজিদা শাহরিয়া

কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প

অবচেতন মনের কথা

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. মেহতাব খানমকে

প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী এই মানুষটি কীভাবে যেন এক হাতে সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণ দক্ষতা আর অন্য হাতে শিশুর সারল্য নিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটেন।

চাতুর্য নয় বরং ধীশক্তি আর সারল্যকে ধারণ করার এই মানুষটির দেবদুর্লভ ক্ষমতা আমাকে বিস্মিত করে।

একদিকে অপরিচিতের বেদনাকে উপলব্ধি করে তার চোখ ভিজতে যেমন দেখেছি, তেমনি হাসতে হাসতে অনুদ্ধত গলায় শক্তভাবে না বলতেও শুনেছি।

এই মানুষটি না থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যের আঙিনায় আমার পা পড়ত না।

প্রাক্-কথা

'কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প' বইটির প্রতিটি ঘটনা সত্য। মনোসামাজিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রতিটি ঘটনাই জীবনের জলছাপ। তাই প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জীবনের রেখাচিত্র।

পরীক্ষামূলকভাবে বিষয়বস্তুর ভিন্নতা আনতে চেয়েছি। সেজন্য অবচেতন মনকে সচেতনভাবে দেখার জন্য দৃষ্টিবিভ্রম বা অপটিক্যাল ইলিউশনকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ আমরা কি জানি না—সেটাই তো আমরা আসলে জানি না।

ছোটোবেলায় রুশ দেশের রূপকথায় পড়েছিলাম, পৃথিবীর সব থেকে দ্রুতগামী বস্তু নাকি মানুষের মন। মনস্তত্ত্ব সেই মনেরই অন্তঃসলিলা নদীর মতো বিভিন্ন অনুভূতির পসরাকে একটি একটি ইটের মতো খুলে খুলে দেখে। মনের আকাশের বাউল বাতাসকে উদাসীনতার নৈরাশ্য থেকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসেই মনস্তত্ত্বের চর্চা প্রয়োজন।

আমি কৃতজ্ঞ স্নেহের অনুজ শাহাদৎ রুমনের কাছে এই বইটির বিষয়সংক্রান্ত যাবতীয় ঝামেলা থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য।

সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ সালেক খোকনের কাছে এই বইটির প্রকাশনাসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য।

বর্তমান সময়ে বইয়ের দুর্মূল্যের এই বাজারেও এমনতর অবিক্রীত থেকে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে প্রকাশ করার জন্য প্রকাশনা সংস্থা কথাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারী জসিম উদ্দিনের প্রতি থাকল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি থাকল আন্তরিক ধন্যবাদ। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে, শেষ পাতে চিন্তার খোরাক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সংযুক্ত করা হয়েছে।

সর্বোপরি, এই বইটি যদি কারো মনের মেঘ সরিয়ে ঝলমলে রোদের হাসি ছোঁয়াতে পারে তবে আমার এই অলেখক সত্তা নিজেকে সার্থক বলে মনে করবে।

ডা. সানজিদা শাহরিয়া
ঢাকা

সূচি

ফোবিয়া	গ্যামোফোবিয়া	১৩
	গ্লসোফোবিয়া	২৮
	অ্যাথাযেগরফোবিয়া	৪৪
নার্সিসিজম	কোভার্ট নার্সিসিস্ট	৬১
	কমিউনাল নার্সিসিস্ট	৯১
প্যালিয়েটিভ কেয়ার	বৃত্তবন্দি	১১১
	পরিযায়ী	১২০
	ভালো মৃত্যু	১৩৯
	আধ্যাত্মিক সংকট	১৪৬
বিবাহবিভ্রাট	না!	১৬৩
	বিশ্বস্ততা	১৭৫
	হিরামন পাখি	১৮৫
	নীলকণ্ঠ	১৯৪
	এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস	২০৩
	সন্দেহ	২০৯
	হৃদয় আমার সূর্যমুখীর মতো	২২২
সিনড্রোম	কুইন বি সিনড্রোম	২৪১
সাইবার জগৎ	ঘোস্ট ওয়ার্কার	২৬১
ট্রান্সজেন্ডার	ভুল শরীরে জন্ম	২৭৩
প্রবাসী	অভিবাসী	২৯১
বহ্নিশিখা	ফেলটু (ডিফল্টার)	৩০৫
	জয়ন্তিকা	৩১৪

কাউন্সেলিং টেবিলের গল্প

অবচেতন মনের কথা

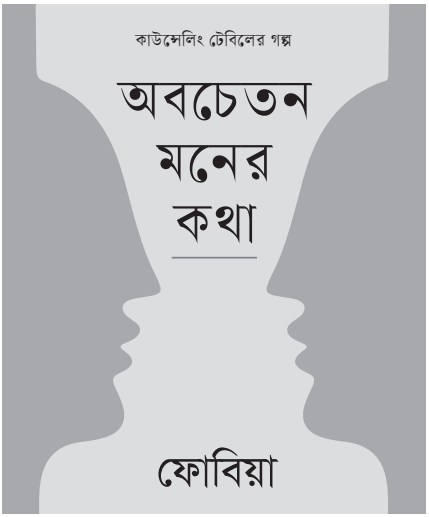

ফোবিয়া

প্রথম অধ্যায়

গ্যামোফোবিয়া

> ‘বিয়ে হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে কল্পনার জয়। আর দ্বিতীয় বিয়ে হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিপক্ষে আশাবাদের জয়।’
>
> –স্যামুয়েল জনসন

‘আমার বিয়ে নিয়ে বাসায় হুলুস্থুল চলছে। অনেক দিন সহ্য করেছি তারপর আর নিতে পারি নাই, বের হয়ে এসেছি বাসা থেকে। আপাতত যেহেতু আমি রিমোট জব করছি, তাই একটা বাসাভাড়া নিয়ে একাই উঠেছি। আপনি বলতে পারেন আমার জন্য এটা একটি বিপ্লব, আমার জীবনে এটা অনেকটা ফরাসিবিপ্লবের কাছাকাছি ঘটনা! আমার বাবা-মায়ের ধারণা আমি তাদের মান-সম্মানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। কেন বিয়ে করব না, এই প্রশ্ন করতে করতে আগে মুখে ফেনা তুলত, ইদানীং শুরু করেছে আমি লেসবিয়ান কি না সেটা জিজ্ঞেস করতে। আমি কীভাবে বোঝাব যে আমি লেসবিয়ান নই, আমার শুধু বিয়ে করতে ইচ্ছা করে না।’

ভদ্রমহিলা বললেন। বয়স ৩৫-এর আশেপাশে। দু-দুটি পোস্ট ডক্টরেট করা এই বয়সেই। এরই মধ্যে হাই ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে প্রকাশিত লেখার সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে।

চুপ করে তাকিয়ে থাকলাম। একদম ছোটো করে ছেঁটে ফেলা চুল। সম্পূর্ণ প্রসাধনী, অলংকার বিবর্জিত। কানে ফুটো পর্যন্ত নেই। কোথায় জানি পড়েছিলাম, 'আপনার ত্বক আপনার শ্রেষ্ঠ প্রসাধনী'। ঝকঝকে চোখ, উজ্জ্বল স্থির দৃষ্টিতে তাকানো, অঙ্গভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ। অদ্ভুত এক আভিজাত্য নিজের অজান্তে ভদ্রমহিলা লালন করছেন।

আমার চেম্বারে আসার আগে ছোট্ট একটা কেস সামারি পাঠাতে হয়। কারণ আমার চেম্বারটা খুব ইনফরমাল সেটআপ। কোনো সাইনবোর্ড নেই; গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। ইচ্ছাকৃতভাবেই হাসপাতাল বা কর্পোরেট গন্ধবিহীন ইনফরমাল সেটআপ রেখেছি; যেখানে মানুষ মনটা সহজভাবে মেলে ধরতে পারে। ভদ্রমহিলা তার জার্নালে পাবলিকেশন লিস্ট জুড়ে দিয়েছিলেন। দেখে আমি বিস্মিত। মনে হলো এ ধরনের অতি উচ্চশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আসলে কি কথা বলার যোগ্যতা আমার আছে? ইদানীং নিজের জ্ঞানহীনতার বহর দেখে খুব বিস্মিত হই নিজে নিজেই।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। চেম্বারে রাখা বইয়ের তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন। জন স্টেইনব্যাকের 'দ্য গ্রেপেস অব র‍্যাথ' দেখে আঙুল ছোঁয়ালেন। মনোযোগ দিয়ে বই দেখছেন।

ফিরে এসে আবার আমার মুখোমুখি বসলেন।

'আপনার কি মনে হয় না, কৃষি অর্থনীতির যে রূপ আমরা দেখি, ওকলাহোমা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় মাইগ্রেশনের যে নির্মমতা স্টেইনব্যাক লিখেছেন সেটা এখনো চলছে?' ভদ্রমহিলা একটু ঝুঁকে আমার দিকে প্রশ্ন করলেন।

'অবশ্যই!' ছোট্ট করে উত্তর দিলাম।

'আমি কেন বিদেশে চাকরি করছি না, কেন বাংলাদেশ থেকে রিমোট জব করছি সেটাও আমার বাবা-মায়ের জন্য সাংঘাতিকভাবে লজ্জার ব্যাপার। কারণ মেয়ে দেশে থাকে, ওদের সবার বন্ধু-বান্ধবদের

ছেলে-মেয়েরা হাইফাই জায়গায় চাকরি করে। আমি বুঝতে পারি না হাইফাই জায়গা কী! তাদের মতের হাই প্রোফাইল আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়। দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি, ঘড়ি, ব্যাগ, এগুলো নাকি স্ট্যাটাস সিম্বল। আমার কোনো স্ট্যাটাস নেই। যে ছেলেগুলোকে বিয়ে করানোর জন্য নিয়ে এসেছিল, বিশ্বাস করেন এক মিনিটও সহ্য করতে পারিনি। কামানো গাল, পারফিউমের গন্ধ, জীবনের যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের কত টাকা উপার্জন করছে তার মধ্যে শেষ। আমার যেহেতু নিজের কোনো পছন্দ ছিল না কাজেই বাবা-মা ছেলে খুঁজছিলেন বিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যে ছেলের সামনে আমি এক মিনিট পরে হাঁসফাঁস করি কীভাবে তাকে বিয়ে করি? আমার নাকি মাথা খারাপ। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনার কাছে।' ভদ্রমহিলা বললেন।

সকালের নরম রোদ্দুর এসে পড়েছে জানালা গলে। চেম্বারের গাছগুলো বেশ ঝোপালো হয়েছে। পাতাগুলো চিকচিক করছে। সেখান থেকে রোদ ঠিকরে সোনার মতো গলে গলে পড়ছে মেঝেতে। কিন্তু এই স্নিগ্ধতা ভদ্রমহিলাকে ছুঁতে পারছে না, বেশ বুঝতে পারছি।

'বিয়েসংক্রান্ত আলাপ উঠলেই সব থেকে প্রথমে আপনি কী অনুভব করেন?' ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জানতে চাইলাম।

প্রথমবারের মতো ভদ্রমহিলাকে ঢোক গিলতে দেখলাম।

হঠাৎ মনে হলো জীবনানন্দ দাশ অবচেতন মনে বুঝি এই মুহূর্তগুলোকেই বলেছেন—

"বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে
যেখানেই রাখি এ হৃদয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, 'ভয়!'

'এই ভয়টি কেমন আর একটু বেশি স্পষ্ট করে বলতে পারেন?' নরম গলায় জানতে চাইলাম।

স্পষ্ট দেখলাম ভদ্রমহিলা কেঁপে উঠলেন। মনে হলো যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইলেকট্রিক শকের মতো একটি শীতল প্রবাহ তিনি অনুভব করলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তীব্র ভয়!'

'কবে থেকে এই ভয় পেতে শুরু করেছেন?'

'মনে করতে পারি না।' ভদ্রমহিলার চোখের মণির নড়াচড়া বলছে তিনি মনে করতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন।

'চা খাবেন?' বলেই বেল টিপলাম।

প্রভাতী নখরেক দরজা খুলে দৃশ্যপটে প্রবেশ করলেন।

ইদানীং তিনি গ্রিন-টি বানানো শিখেছেন। উল্লেখ্য, তার বানানো চা এত জঘন্য যে একজন আমাকে বলেছিলেন, আপনার চেম্বারের চা খেয়ে যাওয়ার পরে যে মেন্টাল ট্রমা আমার হয়েছে সেটা অপূরণীয়।

প্রভাতী জাতিসত্তায় গারো বিধায়, বাংলায় খুব একটা চটপটে না। প্রচণ্ড সোজাসাপটা মানুষ। তাচ্ছিল্য করলে রান্নাঘর থেকে মুহূর্তের মধ্যে বঁটি নিয়ে আসেন। যেহেতু সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ওকে ঘাঁটালে বিপদ।

'এই নতুন ম্যাডামটা কী চা খাবে?' প্রভাতী প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

ভদ্রমহিলা মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'আপনি যেমনটা খাওয়াবেন!'

আমি বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ। কারণ প্রভাতী ইদানীং বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনগুণ দুধে যে চা বানাচ্ছেন সেটা মুখে দেওয়ার অনুপযুক্ত।

'গ্রিন-টি দেওয়া যাবে?' প্রভাতীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'দুধ চা বানাই!' আবদারের সুরে প্রভাতী প্রশ্ন করলেন।

আঁতকে উঠে 'না' করলাম।